সূরা বাকারা - ২

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত সংখ্যা ২৮৬

(মূল বিষয়)

ঈশ্বরীক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন।

(উপ বিষয়)

ঈশ্বরীক প্রতিনিধিত্ব ও একত্ববাদের তিনটি মনোভাবের মধ্যে থেকে বিশ্বাসীদের মনোভাব বেছে নিন।

ইহুদীদেরকে প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বরখাস্ত করার কারণ সমূহ।

যে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সাথে মুসলিম উম্মাহকে প্রতিনিধিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করলে মুসলিম উম্মাহ যে পুরস্কারে পুরস্কৃত হবেন

সামনে ও পিছনের সূরার সাথে সম্পর্ক

১) সূরা ফাতিহার মধ্যে আমারা আল্লাহ তায়ালার কাছে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য দোয়া এবং অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আমাদের সেই আবেদন আল্লাহ তায়ালা কবুল করে আমাদেরকে পুরো কুরআন শরীফ দিয়ে দিয়েছেন যে এই গোটা কুরআন শরীফই হচ্ছে তোমাদের জন্য সরল পথ,সূরা বাকারার দ্বিতীয় আয়াত ذلك الكتٰب لا ريب فيه এর মধ্যে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২) সূরা ফাতিহার মধ্যে আমরা غير المغضوب عليهم দ্বারা আল্লাহ তাআলার অভিশাপ প্রাপ্ত মানব গোষ্ঠী ইহুদীদের পথে না চালানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম, তাই সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বড় একটা অংশ জুড়ে ইহুদীদের অভিশাপপ্রাপ্ত হওয়ার কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে আমরা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

৩) সূরা ফাতিহার মধ্যে আমরা ولا الضالين দ্বারা নাসারা অর্থাৎ খ্রিস্টানদের পথে না চালানোর জন্য আল্লাহর কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম, তাই আল্লাহ তায়ালা সুরা বাকারার পরের সূরা আলে ইমরানের মধ্যে বড় একটা অংশ জুড়ে খ্রিস্টানদের কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে আমরা সেগুলো থেকে বেচে থাকতে পারি।

৪) সূরা ফাতিহার মধ্যে সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার চারটি গুণবাচক নাম রব, রহমান ,রাহিম এবং মালিকের বর্ণনা এসেছে আর সূরা বাকারার মধ্যে ওই চারটি গুণবাচক নামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫) সূরা ফাতিহার মধ্যে বান্দা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তারা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং বিপদে-আপদে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথ

প্রদর্শনের দোয়া করবে, সূরা বাকারার মধ্যে এই তিনটি কাজেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬) সূরা ফাতিহার মধ্যে সংক্ষেপে নিয়ামত প্রাপ্ত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের বর্ণনা এসেছে, সূরা বাকারার মধ্যে এই তিন প্রকারের মানব গোষ্ঠীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূরার শুরু এবং শেষের অংশের মধ্যে সম্পর্ক

অ) সূরা বাকারা একজন প্রকৃত মুমিনের আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে একজন প্রকৃত মুমিনের আলোচনা দিয়ে সূরা বাকারাকে শেষ করা হয়েছে।

আ) সূরা বাকারার শুরুতে একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়গুলির উপর ঈমান এনে থাকে, নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ঠিক তেমনিভাবে সূরা বাকারার শেষের দিকে ওই অদৃশ্য বিষয়গুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে অর্থাৎ ওই অদৃশ্য বিষয়গুলি হচ্ছে কুরআনের ওহি, আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলের রিসালাত ও নবুওয়াত।

ই) যেহেতু সূরা বাকারার মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, বিবাহ, ও বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি

অনেকগুলি আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তাই সূরা বাকারার শেষের দিকে বান্দাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে তারা এই আহকাম গুলি দেখে যেন ভয় না পায় কেননা আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দার ওপর তার শক্তি ক্ষমতার বাইরে কোনো হুকুম দেন না।

সূরা বাকারার নামকরণ

বিভিন্ন তাফসীরের মধ্যে সুরা বাকারার অনেকগুলি নাম খুঁজে পাওয়া যায় যেমন **বাকারা, যাহরা, সানাম, ফুসতাত,** এগুলির মধ্যে অন্যতম এবং সবচেয়ে বেশি পরিচিত হচ্ছে **বাকারা,**

বাকারা শব্দের অর্থ হচ্ছে গাভী, সূরা বাকারাকে বাকারা বলার কারণ হচ্ছে এই সূরার আয়াত নাম্বার ৬৭ থেকে ৭৩ পর্যন্ত একটি গাভীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, ঘটনাটি হচ্ছে বণী ইসরাইলের একজন ধনী ব্যক্তিকে তার ভাতিজা ধনসম্পদের লোভে তাকে হত্যা করে ফেলে, হত্যা করার পর লাশ উঠিয়ে আরেকজনের ঘরের সামনে ফেলে আসে, তারপর নিজেই এসে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর কাছে হত্যার বিচারের দাবি জানায়, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বণী ইসরাইলকে আদেশ করেন যে তারা যেন একটি গাভী জবাই করে এবং ওই জবাইকৃত গাভীর একটি অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তির শরীরে বারি দেয় ফলে ওই মৃত ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত হয়ে

হত্যাকারীর নাম বলে দিবে, কিন্তু বণী ইসরাইল বলে কথা তারা একটি সহজ কাজকে কঠিন থেকে কঠিনতম করে ফেলল, তারা বলতে লাগলো গাভীর রং কি কালারের হতে হবে, সেটি মোটা তাজা হতে হবে নাকি দুর্বল হলে চলবে, সেটির বয়স কত হতে হবে ইত্যাদি।

গাভী জবাই করার নির্দেশের পিছনে তিনটি কারণ

বণী ইসরাইলকে গাভী জবাই করার নির্দেশের পেছনে আল্লাহ তায়ালার তিনটি হিকমত তথা তিনটি কারণ রয়েছে

ক) হত্যাকারীকে তাড়াতাড়ি খুজে বের করা।

খ) ওই সময়টার মধ্যে বণী ইসরাইলের একটি অংশ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের যে আকীদা এবং বিশ্বাস রয়েছে তারা সেটির অস্বীকার করত, তাই গাভী জবাই করার নির্দেশের মাধ্যমে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকে ভুল প্রমাণ করা হয়েছে।

গ) মিশরীয়দের সাথে একটি লম্বা সময় ধরে থাকার কারণে তাদের মধ্যে গাভীর প্রতি গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তাই গাভী জবাই করার নির্দেশের মাধ্যমে তাদের সেই ভালোবাসাকে দাফন করা হয়েছে।

সূরা বাকারার কিছু বৈশিষ্ট্য

সূরা বাকারার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তন্মধ্যে কিছু এখানে বর্ণনা করা যাচ্ছে:

১) সূরা বাকারার মধ্যে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় আয়াত যেটিকে আয়াতে দিয়ানত বলা হয় রয়েছে।

২) অন্যদিকে সুরা বাকারা কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা।

৩) সাওয়াবের দিক দিয়ে কোরআন শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত তথা আয়াতুল কুরসি সূরা বাকারার মধ্যেই রয়েছে।

৪) সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত অর্থাৎ اتقوا يومًا تُرْجَعُونَ فيه الى الله সূরা বাকারায় অবস্থিত।

৫) সূরা বাকারার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের মানুষের বর্ণনা রয়েছে তথা মুমিন, মুনাফিক, কাফির, নেককার, গুনাহগার।

৬) ইসলাম ধর্মের মধ্যে যত গুরুত্বপূর্ণ আহকাম তথা আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার বেশিরভাগই সূরা বাকারার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সদাকা, সুদ, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ইত্যাদি।

সূরা বাকারার ফজিলত

1) হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: তোমরা তোমাদের ঘর সমূহ কে কবর বানিও না, নিঃসন্দেহে শয়তান ওই ঘর

থেকে পালিয়ে যায় যেই ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়(মুসলিম শরীফ- ৭৮০)

2) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সূরা বাকারাকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো, কেননা এটিকে আঁকড়ে ধরা বরকতপূর্ণ এবং এটিকে ছেড়ে দেওয়া দুঃখজনক, এবং অসৎ লোক কখনো এটির মোকাবেলা করতে পারে না, আজকাল আমাদের সমাজে বেশিরভাগ এগুলি শুনতে পাওয়া যায় যে অমুককে যাদু করা হয়েছে তোমককে নষ্ট করা হয়েছে ইত্যাদি, ইসলামে এসবের কোনো ভিত্তি নেই ব্যাপারটা এরকম নয় বরং এগুলিরও অস্তিত্ব রয়েছে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেউ যাদু টোনা করা হয়েছিল, তাই আমি বলব যেসব ঘরেই এসব কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেখানে যাতে বেশি বেশি সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এই সমস্যা দূরীভূত হয়ে যাবে।(সহীহ ইবনে হিব্বান-৩২২)

3) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমানোর আগে সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে সেটি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে(মুত্তাফাকুন আলাইহি), এখানে যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে যেমন সারারাত্র সমস্ত প্রকারের অশুভ খারাপ ক্ষতিকর জিনিস থেকে বিরত থাকবে, অথবা সারারাত্র জেগে থেকে নফল নামাজ পড়লে যে

সাওয়াব হতো এটি তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

4) একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ ওবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন: তুমি কি জানো কোরআন শরীফের শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি তখন তিনি বললেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ভালো জানেন তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সেটি হলো আয়াতুল কুরসি (সহীহ মুসলিম ১৯২১)

5) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে তার এবং জান্নাতে যাওয়ার মধ্যে একমাত্র বাধা হচ্ছে মৃত্যু অর্থাৎ সে মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে (সুনানে নাসাঈ ৯৯২৮)

6) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করে আল্লাহ তাআলা তার জন্য একজন দেহরক্ষী নির্দিষ্ট করে দেন যার কারণে শয়তান সুবেহ সাদিক পর্যন্ত তার কাছে আসতে পারে না(সহীহ বুখারী ২১৮৭)

এক পলকে সূরা বাকারা

উপরের নকশার মধ্যে যেমনটি দেখানো হয়েছে যে সূরা বাকারার একটি মূল বিষয় রয়েছে, আর সেই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে চারটি উপ বিষয় রয়েছে, নিম্নে ঐ

মূল বিষয় ও উপ বিষয়গুলির এক ঝলক দেখানো যাচ্ছে:

মূল বিষয়

আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বছর বয়সে তথা ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, এবং ১৩ বছর পর্যন্ত মক্কায় ইসলামের প্রচার করতে থাকেন, সেই সময় মক্কায় এবং মক্কার আশেপাশে শুধু মুশরিক তথা মূর্তি পূজারী কোরাইশরাই বসবাস করত, সেখানে কোনো আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানরা ছিল না, বরং সেই সময় ইহুদিরা মদিনা এবং মদিনার আশেপাশে বসবাস করত, কারণ ইহুদীরা তাদের ধর্ম গ্রন্থ থেকে জেনেছিল যে শেষ জামানায় সর্বশেষ নবীর আগমন ঘটবে এবং সে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করবে, তাই তারা আগে থেকেই মদিনায় এসে বসবাস শুরু করেছিল যাতে তারা শেষ নবীর উপর ঈমান আনতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার কাফির মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে মদিনায় হিজরত করলেন তখন আশা ছিল যে ইহুদীরা সবার আগে ঈমান গ্রহণ করবেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দ্বীন প্রচারে সাহায্য করবেন, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না, এর কারণ জানতে হলে আমাদেরকে একটু ইতিহাসের দিকে যেতে হবে:

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যাকে জাতির পিতা বলা হয় ওনার দুই স্ত্রী থেকে দুইজন সন্তান

জন্মগ্রহণ করে, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম মা হাজেরা থেকে, এবং হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম মা সারা থেকে, এই দুইজন থেকেই দুইটি বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এর সন্তান ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এবং উনার ১২ জন সন্তান ছিল, যার মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, বাকি ১০ ভাইয়ের মধ্য থেকে একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা, এখান থেকেই ইয়াহুদী শব্দের উৎপত্তি হয়, আর ইসরাইল ইয়াকুব আলাইহিস সালামের লকব তথা ডাকনাম ছিল, আর বণী শব্দের অর্থ হচ্ছে সন্তান তাই ইয়াহুদিদেরকে বনী ইসরাইল বলা হয় অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানরা, অন্যদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশধর কে বনী ইসমাইল বা আরব বলা হয়, বণী ইসমাইল এ হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম ছাড়া আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম পর্যন্ত আর কোনো নবী আসেনি, অন্যদিকে বণী ইসরাইলের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক নবী আসতে থাকে আর এই ধারাবাহিকতা ১৯০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে আমাদের নবীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর চলতে থাকে, এবং এই সময়টার মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের কাজ ও মর্যাদা তাদের হাতেই ছিল এবং তারাই ওই সময় পুরো পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ছিল যেমনটি মহান

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি জায়গায় উল্লেখ করেছেন واني فضَّلْتُكم على العالمين, এই কারণেই মদিনার আশেপাশে বসবাসকারী ইহুদীরা ধারণা করে নিয়েছিল যে সর্বশেষ নবী তাদেরই বংশধর অর্থাৎ বণী ইসরাইলের মধ্য আবির্ভূত হবে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না বরং আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবীকে বণী ইসমাইলের অর্থাৎ আরবের মধ্যে পাঠিয়েছেন,এটিই ইহুদীরা মেনে নিতে পারল না, বরং তারা হিংসায় ফেটে পড়লো এবং ইসলাম ও মুসলমানের চরম দুশমন হয়ে গেল,

সূরা বাকারা যেহেতু মদিনায় হিজরতের পর নাযিলকৃত সর্বপ্রথম সূরা তাই সূরা বাকারার মধ্যে সর্বপ্রথম ইহুদিদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়, এবং তাদেরকে বারবার বুঝানো হয় যে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার কি পরিমাণ নিয়ামত এবং মেহেরবানী রয়েছে, বারবার নাফরমানি করার পরও তাদেরকে মাফ করা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও বেশিরভাগ ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, তাই পরিশেষে ইহুদীদেরকে প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বরখাস্ত করা হল, তাদেরকে পুরো পৃথিবীবাসীর উপর যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তা ছিনিয়ে নেওয়া হল, এবং বণী ইসমাইলের হাতে সেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত ঘোষণা করা হলো এবং তাদের কেবলাও পরিবর্তন করে দেওয়া হলো অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফের

দিকে করে দেওয়া হল, এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া হল, অর্থাৎ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চালু করা।

প্রথম উপ বিষয়

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও একত্ববাদের তিনটি মনোভাব থেকে বিশ্বাসী তথা মুমিনদের মনোভাব বেছে নাও

এই উপ বিষয়টি ১ নাম্বার আয়াত থেকে ৩৯ নাম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত, এর মধ্যে চারটি প্যারাগ্রাফ বর্ণনা করা হয়েছে:

1) - এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১ থেকে আয়াত নাম্বার ২০ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে গোটা মানব মন্ডলীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে মুমিন তথা বিশ্বাসী, কাফির তথা অবিশ্বাসী, এবং মুনাফিক অর্থাৎ যারা বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান প্রমাণ করে এবং অন্তরে কুফুর লুকিয়ে রাখে, প্রথমটি জান্নাতি এবং বাকি দুইটি জাহান্নামী, তাই এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে গোটা মানব মন্ডলীকে আহব্বান করা হয়েছে তারা যেন বিশ্বাসী তথা মুমিনদের মনোভাব বেছে নেয় এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।

2) - এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ২১ থেকে ২৯ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে গোটা মানব মন্ডলীকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ করা হয়েছে যাতে তারা

প্রথম গ্রুপ তথা জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে, আর শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত কেন করতে হবে তার দলিল স্বরূপ বলা হয়েছে যে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের সুবিধার জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন এবং আসমানকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন, এবং আসমান থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন যা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তারই ইবাদত করতে হবে, আর যেহেতু আল্লাহর ইবাদত করতে গেলে তার আহকাম জানা দরকার তাই বলা হয়েছে এই কুরআনের মধ্যে সব আহকাম বলে দেওয়া হয়েছে যদি তোমাদের কেউ এই কুরআনে কোনো সন্দেহ পোষণ করে থাকে তাহলে তাকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম পারলে কুরআনের মতো করে একটি সূরা বানিয়ে দেখাও।

3) - এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ৩০ থেকে ৩৭ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে সর্ব প্রথম কি জিনিসের প্রয়োজন, এবং সেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সময় কিসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে, আর সেই দায়িত্ব পালনের সময় যদি আমাদের থেকে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায় তাহলে কি করনীয়? তাই সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর প্রতিনিধি

বানিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, আর এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ইলম তথা জ্ঞান, এবং এই প্রতিনিধিত্বের কার্যক্রম চালানোর সময় আমাদেরকে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে তার মধ্য থেকে অন্যতম হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনা, যেমনটি শয়তান আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে করেছে, আর শয়তানের এই প্ররোচনার কারণে যদি আমাদের থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তাহলে আমাদের করণীয় হচ্ছে যাতে আমরা অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় যেমনটি আমাদের আদি পিতা-মাতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম করেছেন।

4) - এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ৩৮ থেকে ৩৯ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত নবী রাসুলের মাধ্যমে হিদায়াত তথা সরল পথের বার্তা মানব মন্ডলীর কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন, সুতরাং যারাই এই হেদায়েতের অনুসরণ করবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো প্রকার ভয় এবং দুশ্চিন্তা থাকবে না, আর যারা এই হেদায়েতের অনুসরণ করবে না তারাই হচ্ছে জাহান্নামী, যে জাহান্নামের মধ্যে তারা অনন্ত অসীম কাল থেকে যাবে।

দ্বিতীয় উপ বিষয়

যেসব কর্মকাণ্ডের কারণে ইহুদীদেরকে প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এই উপ বিষয়টি আয়াত নাম্বার ৪০ থেকে ১৪২ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই উপ বিষয়ের মধ্যে দুইটি বড় প্যারাগ্রাফ বর্ণনা করা হয়েছে:

1) এই প্যারাগ্রাফটির মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে ইহুদিদের ওপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও মেহেরবানী সত্ত্বেও তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে,

ইয়াহুদিদের ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামত:-

১) তাদের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী রাসুল সৃষ্টি করেছেন।

২) তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অসংখ্য পার্থিব সুখের ব্যবস্থা করেছেন।

৩) তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের নিকৃষ্ট জুলুম ও অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছেন।

৪) তাদের চোখের সামনে তাদের শত্রু ফেরাউন ও তার লস্করকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছেন।

৫) সিনাই মরুভূমির মধ্যে যেখানে তাদের কাছে থাকা

খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, যেটি মূলত আল্লাহ তাআলার আযাবের একটি অংশ ছিল তখনও আল্লাহ তা'আলা তাদের খাবার জন্য মান্ ও সালওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, মেঘমালার মাধ্যমে তাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাথরকে ফাটিয়ে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন।

ইয়াহুদীদের অসৎ ও নিকৃষ্ট কর্মকান্ড:-

ক) তাদের সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট কাজ ছিল তারা নবী রাসূলকে হত্যা করত।

খ) তাওরাতের যেসব হুকুম আহকাম তাদের মন মত হতো সেগুলিকে তারা বাকি রাখত আর যেগুলি তাদের মন মত হতো না সেগুলিকে তারা মিটিয়ে দিত বা পরিবর্তন করে দিত।

গ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তারপরেও তাদের বেশিরভাগ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনেনি।

ঘ) তারা গরুর বাছুরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছিল।

ঙ) তারা সম্মানিত ফেরেশতা বিশেষ করে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ঘৃণা করতো।

চ) তারা যাদুটনা কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত এবং

জাদুটনার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত।

ছ) সানাই মরুভূমির মধ্যে তারা লোভ ও অধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল।

জ) তারা সবসময় বলে বেড়াতো যে জান্নাতে শুধু ইহুদীরাই প্রবেশ করবে ।

ঝ) তারা এটিও বলে বেড়াতো যে যদি কোনো কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হয় তাহলে তারা শুধুমাত্র কয়েকদিন জাহান্নামে থাকবে তারপর তারা অনন্তকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ঝ) তাদের মধ্যে দুনিয়ার লোভ অতিমাত্রায় ছিল।

ট) তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য অভ্যাস ছিল যে তারা অতিরিক্ত পরিমাণে হিংসা করত, এবং ইয়াহুদী ছাড়া বাকি সব ধরনের মানুষকে তারা মূর্খ মনে করত।

2) এই প্যারাগ্রাফটির মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদীদেরকে তাদের দুই গ্র্যান্ডফাদার হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার জন্য শেষবারের মতো আহবান করা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে অনেক শ্রদ্ধা করে থাকো এবং নিজেদেরকে

তাদের সন্তান মনে করে থাকো, এবং তাদের সন্তান হওয়াকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে কর এবং মানুষের সামনে প্রশংসা করে বেড়াও, তাহলে এখন কি হলো? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামেরই দোয়ার ফসল, যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাবার পুনর্নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন : হে আল্লাহ এই শহরটিকে(মক্কা) শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন, এই শহরবাসীকে ফল ফ্রুট দ্বারা রিজিক দান করুন, এবং তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেন যিনি তাদেরকে আপনার আয়াত সমূহ পড়ে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিবেন, এবং তাদেরকে পুতপবিত্র করবেন।

ঠিক তেমনি ভাবে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যখন তিনি মৃত্যুর সময় উনার সমস্ত ছেলেদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে ? তখন তারা সবাই বলেছিল যে আমরা আপনার খোদা এবং আপনার বাপ-দাদার খোদা অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করব।

তৃতীয় উপ বিষয়

যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে বণী ইসমাইলকে প্রতিনিধিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো

এই উপ বিষয়টি আয়াত নাম্বার ১৪৩ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই উপ বিষয়টির মধ্যে ছয়টি প্যারাগ্রাফ বর্ণনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় উপ বিষয়ের মধ্যে আমরা জেনেছিলাম যে বণী ইসরাইলকে কিসব কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এই উপ বিষয়ের মধ্যে আমরা জানবো বণী ইসমাইলকে যেসব দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সাথে প্রতিনিধিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে:-

1) প্রথম পারাগ্রাফ: মুসলিম উম্মাহর পরিচয়

এটি এই উপ বিষয়ের প্রথম প্যারাগ্রাফ, এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১৪২ থেকে ১৫১ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বণী ইসমাইল তথা উম্মতে মুসলিমার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে,

প্রত্যেক উম্মত তথা সম্প্রদায়ের তিনটি মৌলিক জিনিস থাকে: ১) উম্মতের কেন্দ্রবিন্দু তথা কেবলা, ২) উম্মতের ব্যক্তিত্ব তথা পার্সোনালিটি, ৩) উম্মতের নেতা

১) উম্মতের কেন্দ্রবিন্দু: এই উপ বিষয়ের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে উম্মতে মুসলিমা তথা বণী ইসমাইলের কেন্দ্রবিন্দু তথা কেবলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, উম্মতে মুসলিমার কেন্দ্রবিন্দু তথা কেবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা কাবা শরীফ, এখানে একটি বিষয়

জেনে নেওয়া দরকার সেটি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন আল্লাহর আদেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুমানিক ১৬ মাস আল আকসা মসজিদের দিকে ফিরে নামাজ পড়েছেন অর্থাৎ সেই সময় এটি মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রবিন্দু ছিল, কিন্তু এটি পার্মানেন্ট কেবলা ছিল না, বরং ইহুদীদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আকৃষ্ট করার জন্যই সামান্য সময়ের জন্য কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছিল, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে চাইতেন যে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মার কেবলা যেন পুনরায় কাবা শরীফের দিকে করে দেয়, আর বারবার আকাশের দিকে ফিরে চাইতেন, সুতরাং নামাজরত অবস্থায় ওহী নাযিল হয়ে গেল: হে নবী! আমি লক্ষ্য করেছি যে আপনি ওহী অবতরণের আশায় বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন, অতি শীঘ্রই আমি আপনার কেবলা পরিবর্তন করে দেব বরং এখন থেকেই আপনি আপনার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে করে নিন।

এই কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলাম বিদ্বেষীরা বিশেষ করে ইহুদীরা চারদিকে চিল্লা হাল্লা করতে শুরু করল এবং ইসলামকে বদনাম করতে লাগলো যে এটি কেমন ধর্ম, কয়েক মাস এদিকে ফিরে নামাজ পড়ার আদেশ করে আবার কয়েক মাস অন্যদিকে ফিরে নামাজ পড়ার আদেশ করে, তাই এই

প্যারাগ্রাফের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে কয়েকটি দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে:

১) কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়বো সেটি আসল বিষয় নয়, কেননা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সবই আল্লাহর সৃষ্টি, তাই আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তালার আদেশ, আল্লাহ তায়ালা যেদিকে আদেশ করবেন সেদিকেই আমাদেরকে ফিরে নামাজ পড়তে হবে।

২) কেবলা পরিবর্তনের পেছনে এটিও উদ্দেশ্য ছিল যে যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে প্রকৃতপক্ষে কারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে আর কারা নিজেদের আকল তথা মস্তিষ্ক ও যুক্তির অনুসরণ করে।

৩) যেহেতু বণী ইসরাইলকে প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বরখাস্ত করে বণী ইসমাইলের হাতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে তাই তাদের জন্য একটি পৃথক কেবলা হবে এটিই যুক্তিসাপেক্ষ।

(কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে দুটি প্রসিদ্ধ মতামত রয়েছে সংক্ষিপ্ততার কারণে এটি এখানে বর্ণনা করা হলো না)

২) উম্মতের ব্যক্তিত্ব ও পার্সোনালিটি

যখন আমরা অতীতের উম্মত তথা সম্প্রদায় গুলোর দিকে তাকাই তখন আমরা দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই: ১) অতি বাড়াবাড়ি ২) অতি ছাড়াছাড়ি, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলা বণী ইসমাইল তথা মুসলিম উম্মাহকে মধ্যমপন্থী ঘোষণা করেছেন

অর্থাৎ তাদের মধ্যে না বাড়াবাড়ি থাকবে না ছাড়াছাড়ি, কোরআন হাদিসের মধ্যে আমরা এই মধ্যমপন্থা অবলম্বনের অনেকগুলি উদাহরণ খুঁজে পাই, যেমন
____খ্রিস্টানরা নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী থেকে খোদা পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী পর্যন্ত মানতে রাজি হয়নি বরং তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে অবৈধ সন্তান পর্যন্ত বলেছেন নাউজুবিল্লাহ, অন্যদিকে মুসলমানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে না খোদা বানিয়েছেন না অবৈধ সন্তান বলেছেন, বরং নবীকে নবী হিসেবে মেনেছেন।
____সূরা বনী ইসরাইলের শেষের দিকে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন তোমরা নামাজের মধ্যে না অতি জোরে জোরে কোরআন পড় না অতি আস্তে আস্তে বরং মধ্যমপন্থা বেছে নাও।
____সূরা ফুরকান এর শেষের দিকে মহান আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নেক বান্দারা খরচ করার সময় না অতিরিক্ত খরচ করে না কৃপণতা করে বরং তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

৩) উম্মতের নেতা

উম্মতে মুসলিমার নেতা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

2) দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ: প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব (ব্যক্তির সংশোধন)

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১৫২ থেকে ১৭৭ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফ থেকে মুসলিম উম্মাহকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে এবং তাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তাই এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব বর্ণনা করা হয়েছে, আর সেটি হল:

ব্যক্তির সংশোধন:-

কোনো একটি উম্মত তথা জাতিকে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম উম্মতের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে গড়ে তুলা অপরিহার্য, কারণ একটি সমাজ উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির দ্বারাই নির্মিত হয়, আর এই ব্যক্তির সংশোধনের বিষয়ে তিনটি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে:-

১) উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে ঠিক হতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক বিপদে আপদে দুঃখে কষ্টে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে হবে, বিপদ কেটে গেলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে হবে, আর যদি না কাটে তাহলে সবর ও অধৈর্য্য ধরতে হবে, আল্লাহ তাআলার ওই নিদর্শনসমূহ যেটি তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেগুলির সম্মান করতে হবে।

২) হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং সেগুলিকে মেনে চলতে হবে, এবং এই বিষয়ে মূর্খ পথ ভ্রষ্ট বাপ-দাদার রীতিনীতি অবলম্বন করা যাবে না, বরং এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার আইনকে ফলো করা অপরিহার্য।

৩) ইসলাম ধর্মকে কেবল কয়েকটি রীতিনীতি ও ঐতিহ্য এবং কিছু আংশিক বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবেচনা না করে ধর্মের একটি ব্যাপক ধারণা গ্রহণ করতে হবে যেটি আকিদা, ইবাদত, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, লেনদেন, সামাজিক বিষয় এবং নীতিশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নোট: সূরা বাকারার ১৭৭ নাম্বার আয়াতটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত, তাফসীরুল কুরআনের বড় বড় স্কলাররা বলেছেন যে পুরা কুরআন শরীফে সামান্য কয়েকটি সূরা এবং কয়েকটি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলিকে পুরা কোরআন শরীফের সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে, যেমন সুরা ফাতিহা, সূরা আসর, এবং সূরা বাকারার এই ১৭৭ নম্বর আয়াত।

এই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা দ্বীনে ইসলামের মূল জিনিস গুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন, গোটা দ্বীনে ইসলাম তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ: ১) আকিদা, ২) আমল, ৩) আখলাক, তথা নীতি নৈতিকতা ও আচার

ব্যবহার, এই তিনটি বিষয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মধ্যে অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আমল মূলত দুই প্রকার ১) কিছু আমল রয়েছে যেগুলি আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন নামাজ কায়েম করা, রোজা রাখা, হজ্ব করা, ২) অন্যদিকে আরো কিছু আমল রয়েছে যেগুলি বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন যাকাত দেওয়া, নফল সদাকা করা ইত্যাদি।

এই আয়াতের মধ্যে যদিও হজ্ব এবং রোজার বর্ণনা আসেনি কিন্তু সামনে কয়েকটি আয়াত পরেই পৃথক পৃথক ভাবে হজ্ব এবং রোজার বর্ণনা আসতেছে।

3) তৃতীয় প্যারাগ্রাফ: প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্ব (সমাজের সংশোধন)

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১৭৮ থেকে ১৮৮ পর্যন্ত বিস্তৃত, আমরা জানি যে ব্যক্তির সংশোধনের পরে সমাজ সংস্করণের নাম্বার আসে, তাই এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে সমাজ সংস্করণের চারটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে:-

১) মানুষের জীবন রক্ষার গ্যারান্টি থাকতে হবে এবং তার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২) মানুষের সম্পদ রক্ষার গ্যারান্টি থাকতে হবে এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত মালিককে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৩) রোজার সিস্টেম থাকতে হবে, যাতে করে তার মাধ্যমে তাকওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়।

৪) সম্পদ তৈরির জন্য একটি সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সম্পদ অর্জন করার অনৈতিক পদ্ধতি এবং ঘুষ নিষিদ্ধ করতে হবে।

_____এক কথায় এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা হতে হবে যার মূলনীতি হবে ন্যায় এবং তাকওয়া,(প্রথম দুইটি মূলনীতির মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কে হাইলাইট করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় দুইটি মূলনীতির মধ্যে তাকওয়াকে হাইলাইট করা হয়েছে)

4) চতুর্থ প্যারাগ্রাফ: প্রশিক্ষণের তৃতীয় পর্ব (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা)

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১৮৯ থেকে ২২০ পর্যন্ত বিস্তৃত, আমরা জানি যে সমাজ সংস্করণের পরে রাষ্ট্র গঠনের নাম্বার আসে, তাই এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বর্ণনা এসেছে, কারণ মুসলিম উম্মাহকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে আল্লাহর জমিনে

আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ব্যতীত পুরোপুরি পালন করা একেবারেই সম্ভব নয়, একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে দুইটি: ১) জীবন দিয়ে জিহাদ করা, ২) অর্থ সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা যেটিকে আরবি ভাষায় ইনফাক্ ফি সাবিলিল্লাহ বলা হয়,

তাই এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে ইনফাক্ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা এবং জিহাদ বিন নাফস্ অর্থাৎ জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এই দুইটি জিনিসের বর্ণনা করা হয়েছে, সাথে সাথে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আরেকটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হল হজ্ব, হজ্ব ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্য থেকে একটি স্তম্ভ, যেমনটি আমি পিছনে বর্ণনা করেছিলাম যে হজ্ব এবং রোজার বর্ণনা সামনে পৃথক পৃথক ভাবে আসতেছে,

হজ্বকে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সাথে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, হজ্ব ইসলামের এমন একটি আমল যেটি কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোথাও আদায় করা সম্ভব নয়, আর কাবা শরীফ তখনও পর্যন্ত কাফের মুশরিকদের অধীনস্থে ছিল, তাদের অধীনস্থ থেকে কাবা শরীফকে মুক্ত করা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল, তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সাথে হজ্বের বর্ণনা করা হয়েছে।

5) পঞ্চম পারাগ্রাফ: প্রশিক্ষণের চতুর্থ পর্ব (ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা)

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ২২১ থেকে ২৪২ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে একটি সুস্থ পরিবার ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা কিরকম হওয়া দরকার সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কারণ যতক্ষণ না আমাদের পরিবার ব্যবস্থা ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ঠিক হওয়া অসম্ভব, পরিবার ব্যবস্থাই আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বরূপ, অনেকগুলি পরিবার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা গঠিত হয়, এই পুরা প্যারাগ্রাফের সারমর্ম হচ্ছে তিনটি জিনিস:
১) ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠা, ২) সততার সাথে একে অপরের অধিকারকে সম্মান করা, ৩) অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বিরত থাকা,

উপরে এই প্যারাগ্রাফের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে, এবার আসুন সামান্য একটু ব্যাখ্যা করা যাক:-

পরিবার ব্যবস্থাপনার ১২ টি রুপরেখা:-

১} মুশরিক পুরুষ ও মহিলা অর্থাৎ যারা কোনো আসমানী কিতাবের অনুসারী নয় তাদের সাথে কোনোভাবেই বিবাহ জায়েয নেই।

২} নন মুসলিম আহলে কিতাব অর্থাৎ যারা কোনো আসমানী কিতাবের অনুসারী তাদের মহিলাদের সাথে যদিও মুসলিম পুরুষের বিবাহ জায়েয রয়েছে তবুও তার পরিবর্তে কোনো মুসলিম নারীকে বিবাহ করা উত্তম।

৩} মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবে না, কিন্তু একে অপরকে আলিঙ্গন, একে অপরের সাথে উঠাবসা, ঘুমানো এতে কোনো সমস্যা নেই, অন্যদিকে ইহুদীরা মহিলাদের মাসিক অবস্থায় তাদের সাথে ওঠাবসা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়, আর খ্রিস্টানরা মাসিক অবস্থায় সহবাস করাকেউ কোনো কিছু মনে করে না, মুসলিম উম্মাহর মধ্যমপন্থী হওয়ার এটি আরেকটি উদাহরণ।

৪} কোনো ব্যক্তি যদি কসম খেয়ে বলে যে সে চার মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীর কাছে যাবে না শরীয়তের ভাষায় এটিকে ইলা বলা হয়, এমতাবস্থায় সে যদি চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে না যায় তাহলে চার মাস পার হতেই স্ত্রীর উপর এক তালাকে বাইন পড়ে যাবে, এই স্ত্রীর সাথে আবার সংসার করতে চাইলে নতুন করে বিবাহ করতে হবে, কিন্তু চার মাস পার হওয়ার আগে আগে যদি সে রুজু অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে তাহলে এমতাবস্থায় তালাক পড়বে না কিন্তু তাকে কসম ভঙ্গ করার কারণে কসমের কাফ্যারা দিতে হবে।

৫} তালাক: ইসলামের মধ্যে যত হালাল বিষয় রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক, এটি আমার কথা নয় বরং এটি হাদিসের ভাষা, বিশেষ কিছু পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে তালাককে ইসলামের মধ্যে হালাল করা হয়েছে, যেমন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থেকে কেউ একজন বা উভই একে অপরের আচরণে অধৈর্য হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় তালাক, ডিভোর্স ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকে না, এইরকম পরিস্থিতিতে ইসলামে তালাককে হালাল করা হয়েছে আমাদের উপকারে, কিন্তু এটি ভিন্ন বিষয় যে আমাদের সমাজের একশ্রেণীর লোকেরা এই তালাকে হাসির পাত্র বানিয়ে ফেলেছে, কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, এমতাবস্থায় সে কঠিন গুনাগার হবে কিন্তু তালাক পরে যাবে।

৬} এক তালাক এবং দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বহাল করার সুযোগ থাকে, কিন্তু তিন তালাক দিয়ে দিলে ওই স্ত্রীর সাথে কোনভাবেই সম্পর্ক বহাল করার সুযোগ থাকে না।

৭} হালালা: কিন্তু ওই তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বার অন্য কোথাও বিয়ে করে ফেলে, এবং কোনো কারণে ওই দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয় বা দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হয়ে যায়, এমতাবস্থায় প্রথম স্বামী পুনরায়

তাকে বিয়ে করতে পারবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অপ্রত্যাশিত বিষয়টিকে আজ আমাদের সমাজে হালালার নামে একটি ঘৃণার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে, আমাদের সমাজে আজ তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার জন্য আগে থেকে কন্ট্রাক করে টাকা দিয়ে হালালা করানো হয়, ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, বরং যে হালালা করায় এবং যে করে উভয়ের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন, এই জঘন্য কাজ যদি কেউ করে ফেলে তার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কিনা এর মধ্যে ইসলামিক স্কলারদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

৮} মোহরানা: স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে যা কিছু দেয় স্বামীর জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয নাই,

৯} খোলা: কিন্তু খোলার মাধ্যমে মোহর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই, স্ত্রী যদি পুরা মোহরানা বা মোহরানার একটি অংশ এই শর্তসাপেক্ষে স্বামীকে দিতে রাজি হয় যে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিবে এটিকে ইসলামের পরিভাষায় খোলা বলা হয়, খোলার মধ্যে স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি আবশ্যক।

১০} শিশুকে বুকের দুধ পান করানো: ইসলাম যেহেতু

একটি ন্যায়, অনুগ্রহ এবং কৃপার ধর্ম, তাই এখানে কোনো প্রকার জুলুম ও অত্যাচারকে বরদাস্ত করা হয় না, বরং এখানে ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা, ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকের অধিকারকে রক্ষা করা হয়েছে, তাই ইসলাম মা জননীদেরকে তাদের শিশুদেরকে বুকের দুধ পান করানোর আদেশ দিয়েছেন, আজ ১৪ শত বছর পর বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে ডাক্তাররা বলেন যে মায়ের দুধের বিকল্প আর কিছু নেই, অথচ মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগেই তা বর্ণনা করে দিয়েছেন যখন কোন বিজ্ঞান ছিল না, যখন মানুষ অজ্ঞতার চরম মাত্রায় পৌঁছেছিল।

এমতাবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় তখনও ইসলাম শিশুকে লালন পালন ও দুধ পান করানোর দায়িত্ব মাকে দিয়েছেন, স্বামী স্ত্রীর কর্মকাণ্ডের ফল যাতে শিশুর উপর পতিত না হয় সেদিকে ইসলাম লক্ষ্য রেখেছেন।

১১} **ইদ্দত:** স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে যে সময়ের জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক বাড়ীতে থাকতে হয়, অন্যত্র যেতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না তাকে “ইদ্দত” বলে,

তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে তিন মাসিক শেষ হওয়া পর্যন্ত,

এবং যদি স্বামীর মৃত্যু হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে ইদ্দতের

সময়সীমা হচ্ছে চার মাস দশ দিন।

১২} ইদ্দত চলাকালীন কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া জায়েয নেই, তবে মনে মনে বিয়ে করার আগ্রহী হওয়া, এবং ইশারা ইঙ্গিতে সেই আগ্রহ প্রকাশ করতে কোনো বাধা নেই।

6) ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফ: মুসলিম উম্মার শৃংখল, সঙ্ঘবদ্ধতা ও নিয়মনিষ্ঠা:-

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ২৪৩ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে মূলত দুইটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে: ১) মুসলিম উম্মাহর সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠা ২) সংগঠনের অর্থায়ন

মুসলিম উম্মার সাংগঠনিক শৃংখলা ও নিয়মনিষ্ঠা

এখানে ৪ টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে:

১) সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে জান ও মাল কোরবান করার আবেগ সৃষ্টি করা,

এই প্যারাগ্রাফের শুরুতে বণী ইসরাঈলের একটি গোত্রের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিল, কিন্তু পালিয়ে কোনো লাভ হয়নি, এখান থেকে জান কোরবান করার শিক্ষা পাওয়া

যায়, এর পরবর্তী আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে, আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেন, এখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় মাল কোরবান করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

২) সংগঠনের লিডার সিলেকশন এবং তার কোয়ালিটি, হযরত তালুতের কাহিনী থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে লিডার তথা আমীর সিলেকশন হতে হবে শিক্ষা শারীরিক শক্তি এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে, টাকা-পয়সা ধন সম্পদের ভিত্তিতে নয়।

৩) সময় অসময় সদস্যদের পরীক্ষা নিতে হবে যে কারা লিডার তথা আমিরের কথামতো চলে, আর কারা নিজের মর্জি মতো চলে, হযরত তালুতের লস্করকে নদীর পানি পান করা নিষিদ্ধ করার কাহিনী থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায়।

৪) মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তাদেরকে সহী আকিদার মধ্যে রাখতে হবে, আয়াতুল কুরসি, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং নমরুদের কথোপকথন, এবং এরপরে হযরত উজাইর এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পরে পুর্নজীবনের দুইটি কাহিনী থেকে সঠিক শিক্ষা এবং সহী আকিদার শিক্ষা পাওয়া যায়।

সংগঠনের অর্থায়ন

সংগঠনের অর্থায়নের ক্ষেত্রে এখানে ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, আর এই সম্পর্ক দুই রকমের হতে পারে, ১) দয়া এবং করুনার সম্পর্ক, ২) স্বার্থপরতার সম্পর্ক,

দয়া এবং করুনার সম্পর্কের মধ্যে দুইটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে: একটি হচ্ছে সদাকা, অন্যটি হচ্ছে একে অপরকে ঋণ দেওয়া, দুইটিই ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং অনেক বড় সাওয়াবের কাজ,

স্বার্থপরতার সম্পর্কের মধ্যে একটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে সুদ, আর সুদ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং একটি ভয়ঙ্কর গুণার কাজ।

এক কথায় এখানে তিনটি বিষয় ব্যাখ্যার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে ১) সদাকা এবং তার বিভিন্ন দিক, ২) সুদ ও তার বিভিন্ন দিক, ৩) ঋণ এবং তার বিভিন্ন দিক।

সদাকা এবং তার বিভিন্ন দিক

- **সদাকা কবুল হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত:-**

১) সদাকাকারী মুসলমান হতে হবে।
২) ইখলাসের সাথে সদাকা হতে হবে, অর্থাৎ সদাকা সাওয়াবের নিয়তে আল্লাহকে খুশি করার জন্য হতে হবে লোক দেখানো যাতে না হয়।
৩) সদাকা হালাল মাল থেকে হতে হবে, কেননা হারাম

মালের সদাকা কবুল হয় না।
৩) যে ব্যক্তিকে সদাকা দেওয়া হল সদাকা করার পর তাকে খোটা দেওয়া যাবে না।
৫) তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া যাবে না।

- **সদাকা করার দুইটি আদব:-**

১) মন ভরে দিলের প্রশস্ততার সাথে সদাকা করা উত্তম।
২) লুকায়িতভাবে সদাকা করা উত্তম, যাতে কেউ না দেখে, হোক সেটি দিনে কিংবা রাতে।

- **সদাকা কাকে দিতে হবে:-**

ইসলামে যাদেরকে সদাকা দেওয়ার জায়েয তাদের সংখ্যা ৮, এগুলি ইনশাআল্লাহ সামনে যাকাত কাকে দিতে হবে সেখানে বর্ণনা করা হবে, এখানে আরেকটি জিনিস মনে রাখা ভালো ইসলামে সদাকা দুই প্রকার: ১) সদাকা নাফিলা, ২) সদাকা ওয়াজিবা অর্থাৎ যাকাত, প্রত্যেকটির হুকুম ও আহকাম ভিন্ন,

এখানে এক বিশেষ প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে যেটি ওই আট প্রকারের মধ্য থেকে এক প্রকারের মধ্যে এসে যায়, আর এটি হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা নিজেদেরকে দ্বীনের খেদমতের কাজে লাগানোর কারণে তাদের জন্য অন্য কোনো কাজ, রুজি রোজগার, ইনকাম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, এমনকি তারা মানুষের সামনে নিজের অবস্থাও প্রকাশ করে না, আল্লাহ তাআলা

এখানে ঐ সমস্ত লোককে সদাকা দেওয়ার জন্য আহবান করেছেন এবং তাদেরকে সদাকা দেওয়া অনেক উত্তম কাজ।

সুদ এবং তার বিভিন্ন দিক

- আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কে হালাল করেছেন।
- **সুদ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি দমক:-**

১) সুদখোর কেয়ামতের দিন পাগলের মত এদিকে ওদিকে ঢলে পড়বে।
২) সুদখোর জাহান্নামে যাবে।
৩) আল্লাহ দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন এবং সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন।
৪) সুদ ঈমানের দাবির পরিপন্থী।
৫) সুদখোরের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে।

ঋণ এবং তার বিভিন্ন দিক

- **ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে চার ব্যক্তির বর্ণনা:-**

১) দাইন অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণ দেয়।
২) মাদয়োন অর্থাৎ যাকে ঋন দেওয়া হয়।
৩) কাতিব অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণের বিষয়াবলী লিখে।

৪) ঋণের সাক্ষী।

- **ঋণ সম্পর্কিত চারটি আহকাম:-**

১) যদি কোনো ব্যক্তিকে ঋণের বিষয়াবলী লেখার জন্য বলা হয় সে যাতে মানা না করে, এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে লিখে।
২) যাকে ঋনের সাক্ষী বানানো হয় সে যাতে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষী দেয়, এবং সাক্ষী দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ না করে।
৩) যদি কোনো কিছু বন্ধক দিয়ে ঋণ নেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে বন্ধককৃত জিনিসকে ব্যবহার করা যাবে না এবং ঋণ পরিশোধ করার সাথে সাথে বন্ধককৃত জিনিসকে ফিরিয়ে দিতে হবে।
৪) যদি কাউকে বিশ্বাস করে সাক্ষী এবং লেখালেখি ছাড়া ঋণ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে যাকে ঋন দেওয়া হল সে যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে, এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধ করে দেয়।

চতুর্থ উপ বিষয়

যেসব দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সাথে আমাদেরকে প্রতিনিধিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো, অর্থাৎ তৃতীয় উপ বিষয়ের মধ্যে আমাদেরকে যেসব আহকাম তথা আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যদি আমরা সেগুলোর উপর সহীহ নিয়তের

সাথে যতটুকু সম্ভব আমল করে থাকি, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানবমন্ডলীর উপর আমাদের আধিপত্য রাজত্ব এবং ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকবে।

এই উপ বিষয়টি আয়াত নাম্বার ২৮৪ থেকে ২৮৬ পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ শেষের তিন আয়াত,
এই উপ বিষয়ের মধ্যে মূলত তিনটি প্যারাগ্রাফ বর্ণনা করা হয়েছে:-

1) প্রথম প্যারাগ্রাফ:

এখানে দুইটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে:

১) যে আল্লাহ সমস্ত জমিন ও আসমানের মালিক সে আল্লাহ প্রতিনিধিত্ব পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে।
২) জমিন ও আসমানের মালিক আল্লাহ আমাদেরকে যে আহকামগুলো দিয়েছেন তার হিসাব-নিকাশ নিয়ত ও এখলাসের উপর ভিত্তি করে হবে।

2) দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ:

এখানে তিনটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে:

১) মুসলিম উম্মাহকে প্রতিনিধিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পর তাদেরকে যে নতুন বিধান দেওয়া হয়েছে তার

ওপর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ও তার সাহাবা ঈমান এনেছেন সুতরাং তোমরাও তার উপর ঈমান আনো।
২) উম্মতে মুসলিমা বনী ইসরাইলের ইয়াহুদীদের মত নবীদের মধ্যে পার্থক্য করে না বরং তারা বনী ইসরাইল ও বনী ইসমাইল উভয় বংশের নবীদের উপর ঈমান আনে।
৩) উম্মতে মুসলিমা বনী ইসরাইলের ইহুদিদের মত سمعنا و عصينا অর্থাৎ আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না,, বলেনা বরং তারা বলে سمعنا و اطعنا অর্থাৎ আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।

3) তৃতীয় প্যারাগ্রাফ:

এখানে ছয়টি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে:

১) আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত বিধি-বিধান উম্মতে মুসলিমাকে দিয়েছেন তারা তার ওপর যতটুকু সম্ভব আমল করতে পারবে।
২) যারা ভালো কাজ করবে তাদেরকে ভালো কাজের পরিণাম দেওয়া হবে, আর যারা খারাপ কাজ করবে তাদেরকে খারাপ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে।
৩) বিধি-বিধান পালন করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, সেটি ক্ষমার যোগ্য।
৪) বনী ইসরাইলকে যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে

সেইসব পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।
৫) কাফেরদের উপর বিশেষ করে বনী ইসরাইলের উপর আধিপত্য অর্জন করতে হলে সব সময় আমাদেরকে চেষ্টা করে যেতে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।
৬) কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমা তথা বনী ইসমাইলের মোকাবিলা বনী ইসরাইলের সাথে হতে থাকবে।

আমাদের শিক্ষা

এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে কুরআনে কারীমের প্রতিটি সূরার প্রতিটি আয়াতের মধ্যেই আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে কিন্তু তারপরেও যেহেতু এই কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করে লেখা হচ্ছে তাই সামান্য কিছু শিক্ষা এখানে বর্ণনা করা যাচ্ছে:-

১) পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বাণী এতে কোনো সন্দেহ নেই, যদি এর মধ্যে কারো সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে সে এই কোরআনের মত করে একটি আয়াত অথবা একটি সূরা বানিয়ে দেখাক।
২) এই সূরার মধ্যে গোটা মানব মন্ডলীকে আল্লাহ তাআলা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, প্রথম দুইটিকে তথা

কাফের এবং মুনাফিককে জাহান্নামী ঘোষণা করেছেন এবং তৃতীয়টিকে অর্থাৎ মুমিন মুসলমানদেরকে জান্নাতি ঘোষণা করেছেন, তাই আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমরা কোনটির অন্তর্ভুক্ত।

৩) হযরত আদম আলাইহিস সালাম ইলম তথা জ্ঞানের কারণে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাই সম্মানিত হতে হলে আমাদেরকেউ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৪) যদি আমাদের থেকে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর মত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, শয়তানের মত তাকাব্বুরী এবং অহংকার করা যাবে না।

৫) আমাদের পূর্বে বনী ইসরাইলকে যেসব কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এবং অভিশপ্ত হতে হয়েছে, এইসব কর্মকাণ্ড থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে, এবং তাদের পরিণতি থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় আমাদের অবস্থাও তাদের মত হতে পারে।

৬) হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লতের অনুসরণ করতে হবে কেননা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম কে মিল্লতে ইব্রাহিমের উপর প্রতিষ্ঠিত করেই পাঠানো হয়েছে, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত এবং রিসালাতের উপর ঈমান আনতে হবে।

৭) মুসলমানদের উচিত তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্য জাতির অনুকরণ না করা।

৮) সাহাবায়ে কেরাম হক তথা সত্যের মানদন্ড, তাদের ইজ্জত এবং সম্মান করতে হবে, তাদেরকে ন্যায়পরায়ন মানতে হবে, ঈমান ও আমলে তাদেরকেও অনুসরণ করতে হবে।

৯) বনী ইসরাইলের ইয়াহুদিরা সব সময় এমনকি আজও তাদের কেবলা তথা হাইকেলে সোলাইমানীকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এটিকেই তারা পুরা ধর্ম বিবেচনা করে থাকে, তাই মহান আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন যে তোমরা কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়বে তোমাদের কেবলা কি হবে সেটি বড় বিষয় নয়, বরং আসল বিষয় হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর ঈমান আনা, নেক আমল করা, আখলাক, চরিত্র ও আচার ব্যবহার ঠিক করা, একে অপরের সাথে লেনদেন পরিষ্কার রাখা,

১০) মুসলিম উম্মাহর ওপর আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসের রোজা ফরজ করেছেন, তাই প্রত্যেক এডাল্ট নরনারী মুসলমানের উপর রোজা রাখা আবশ্যক।

১১) মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহ তায়ালা হজ্ব ফরজ করেছেন,

১২) মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে,

যার হুকুম বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন হয়ে থাকে, এই জিহাদের বিষয়কে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে, আর যারা চেষ্টা করছে তারা জেনে বুঝেই আগে থেকে নির্ধারিত প্ল্যান অনুযায়ী এটি করছে, অথচ তারা কখনো কোনো ডিকশনারি খুলে দেখিনি যে জিহাদের অর্থ কি, অথচ পৃথিবীর প্রায় সকল ডিকশনারির মধ্যেই জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চেষ্টা করা, কঠোর পরিশ্রম করা, আর পরিভাষায় ইসলামকে রক্ষা ও প্রসারের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়, পৃথিবীর এমন কোনো ধর্ম নেই যে ধর্মে সেই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং প্রসারের জন্য চেষ্টা করতে বলা হয়নি, কিন্তু আজ এই কথা ইসলাম বলেছে বলে এটিকে বদনাম করা হচ্ছে।

১৩) বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে পৃথিবীর কোনো ধর্মে এমন বিধান দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠা থাকতে হবে, সততার সাথে একে অপরের অধিকারকে সম্মান করতে হবে, একে অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতন করতে পারবে না।

১৪) আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল কোরবান করতে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৫) মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বিশ্বাস রাখতে হবে, আমাদের এই দুনিয়ার জীবন শেষ জীবন নয়, আসল

জীবন হচ্ছে মৃত্যুর পরের জীবন, যে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার জীবন দিতে সক্ষম হয়েছে সে আল্লাহ মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম, আমরা এই দুনিয়াতে যা কিছু করব তার বিচার ও ফলাফল পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মৃত্যুর পরে জীবিত হয়ে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, সূরা বাকারার মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলার চারটি জায়গায় পুনর্জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন:১) গাভী জবাই করার ঘটনা, ২) বনী ইসরাঈলের একটি গোত্রের ঘটনা যারা মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে ছিল, ৩) হযরত ওজাঈর আলাইহিস সালাম এর ঘটনা, ৪) হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর ডাকে পাখি জীবিত হওয়ার ঘটনা।

১৬) আল্লাহ তাআলার সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন।

১৭) সুদ খোরের জন্য আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

১৮) আল্লাহ তায়ালা সদাকা কে বৃদ্ধি করেন এবং সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন।

১৯) মুসলিম উম্মাহকে তাদের শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো বিধান দেওয়া হয়নি, তাই তারা ইখলাস এবং সহী নিয়তের সাথে যতটুকু সম্ভব আমল করতে পারবে।

২০) সূরা বাকারার একেবারে শেষের আয়াতের মধ্যে

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কয়েকটি সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন, এই দোয়াগুলি আমাদের মুখস্ত করা দরকার, এবং সবসময় আল্লাহর শিখানো এই দোয়া গুলি করা দরকার।

ইতিহাসের সাক্ষী

হারুত এবং মারুতের ঘটনা

সূরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াতের মধ্যে হারুত ও মারুত ফেরেশতার বর্ণনা এসেছে, এখানে সংক্ষেপে তাদের সামান্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হচ্ছে,

বনী ইসরাইলের ইহুদিদের ওপর আল্লাহ তাআলা কিরকম মেহেরবানী ও দয়া করেছেন তার এক ঝলক পিছনে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইসব মেহেরবানীর মধ্য থেকে তাদের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবানী হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাওরাতের মত একটি আসমানী কিতাব দিয়েছেন যার মধ্যে হেদায়ত, আলো, জীবন বিধান এবং সবকিছুর বর্ণনা ছিল, কিন্তু তারা এই তাওরাত কে ছেড়ে দিয়ে যাদুটোনা শিখতে লাগলো, এবং শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যিনি মানুষ, জ্বীন, পাখি এবং হাওয়ার উপরেও রাজত্ব করেছেন, তা তিনি জাদুর মাধ্যমেই করেছেন,

এবং স্বয়ং তিনি একজন বড় জাদুঘর ছিলেন, এমনকি জীবনের শেষ অংশে তিনি তার ধর্ম ত্যাগ করেছেন নাউজুবিল্লাহ,

তাই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তাদের মিথ্যাচারের উত্তর দিয়েছেন যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কুফুরি করেননি, না তিনি নিজে জাদু শিখেছেন না অন্যকে শিখিয়েছেন,

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে মানুষের সাথে জ্বীনদের দিও তিনি কাজ করাতেন, ওই জ্বীনদের মধ্যে কিছু খারাপ প্রকৃতির জ্বীনরাও ছিল যারা প্রকৃতপক্ষে এসব জাদুটোনা শিখাতেন।

একটা সময় পুরো পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ করে ইরাকের বাবিল শহরে যাদু টোনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, এমনকি তারা মোজেজা এবং জাদু দুনোটিকে একই ভাবতে লাগলো, এবং অনেক জাদুঘরের অনুসরণ ও অনুকরণকে দ্বীনের অংশ মনে করতে লাগলো, এবং জাদু শিখাকে সওয়াবের কাজ মনে করতে লাগলো।

হারুত ও মারুত ফেরেশতাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য

যখন তারা মোজেজা এবং জাদু দোনোটিকে একই ভাবতে লাগলো তখন আল্লাহ তা'আলা হারুত ও মারুত নামের দুজন ফেরেশতাকে মানুষের রূপে প্রেরণ করল যাতে তারা যাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষকে বুঝায় এবং

জাদু এবং মোজেজার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে, কারণ মোজেজা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ক্রিয়া, যার মধ্যে বাহ্যিক কোনো সববেরও অবকাশ নেই, অন্যদিকে জাদুর মাধ্যমে যে ক্রিয়াকলাপ দেখানো হয় সেটি এই দুনিয়ারই একটি অংশ, যার মধ্যে কুফরি কালাম এবং বিভিন্ন খবিস আত্মার সাহায্য নেওয়া হয়,

জাদু এবং মোজেজার বাস্তবতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার সময় সেই ফেরেশতাদেরকে অনেক সময় যাদুর বিভিন্ন পদ্ধতিও বলতে হতো, এবং সাথে সাথে ওই ফেরেশতারা এটিও বলে দিত যে, দেখো আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরীক্ষা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, আমরা এই যাদু এবং মোজেজার বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে তোমাদেরকে যাদুর বিভিন্ন পদ্ধতিও বলে থাকি যাতে তোমরা এগুলি থেকে বেঁচে থাকো এবং জাদু এবং মজেজার পার্থক্যকে ভালোভাবে বুঝে নাও, কিন্তু যদি তোমরা এর বিপরীত করে থাকো তাহলে তার দায়িত্ব আমাদের নয়,

অবশেষে নাফরমান, বদমাশ লোকেরা ফেরেশতাদের কথার কোনো দাম দেয়নি, এবং তারা এই জাদুর মাধ্যমে বিভিন্ন জঘন্য কাজ করতে লাগলো, যেমন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া, কাউকে যাদু করে মৃত্যুর কবলে ঢেলে দেওয়া ইত্যাদি।

তালুত এবং জালুতের ঘটনা

সূরা বাকারার আয়াত নাম্বার ২৪৬ এর মধ্যে তালুত এবং জালুতের ঘটনার বর্ণনা এসেছে, এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই ঘটনার এক ঝলক তুলে ধরা হচ্ছে,

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন বনী ইসরাইলকে ফেরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে তাদেরকে নিয়ে মিশর থেকে ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন তখন বনী ইসরাইলকে আদেশ করলেন তারা যেন ফিলিস্তিনকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধে নামে, কারন ফিলিস্তিন ওই সময় কওমে ওমালাকার নিয়ন্ত্রণে ছিল, কিন্তু বনী ইসরাইলরা কওমে ওমালাকাদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল, এবং মুখের সামনে বলে দিল যে, আপনি এবং আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন আমরা এখানে বসে আছি, এই বেয়াদবির শাস্তি হিসেবে তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে ৪০ বছর আটকে রাখা হয়েছিল, এবং এই অবস্থার মধ্যেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন,

তারপর হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের একটা অংশ মুক্ত করা হয়, হযরত ইউশা জীবনের শেষ অংশ পর্যন্ত বনী ইসরাইলের দেখাশোনা করেছেন, এবং তাদের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসার জন্য কাজী সিস্টেম চালু করে দেন, আনুমানিক ৩০০ বছর

পর্যন্ত এভাবেই কাজী সিস্টেম চলতে থাকে, এবং এই ৩০০ বছরের মধ্যে বনী ইসরাইলের কাউকে নবী ও বাদশা বানানো হয়নি, তাই আশেপাশের মূর্তি পূজারীরা যখন তখন তাদের উপর হামলা করে দিত, এইভাবে একদিন ফিলিস্তিনের মূর্তি পূজারীরা তাদের উপর হামলা করে তাদের মোবারক সন্দুক যার মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত হারুন আলাইহিস সালামের স্মৃতি ছিল, তাওরাতের কিছু অংশ বিশেষ ছিল, এবং আসমানী খাদ্য মান্ ও সালওয়া ছিল,

এমতাবস্থায় একজন কাজী যার নাম শ্যামওয়েল ছিল, নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, কিন্তু তারপরেও বনী ইসরাইলের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বন্ধ হয়নি, তাই তারা সবাই মিলে হযরত শ্যামওয়েলের কাছে আবেদন জানায় যে, কাউকে তাদের বাদশা বানিয়ে দেওয়া হোক যার মাধ্যমে তারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবে, তখন হযরত তালুককে বাদশা বানানো হল, কিন্তু বনী ইসরাইলরা যেমনটি তাদের পুরাতন অভ্যাস, তারা তালুতকে বাদশাহ মানতে স্বীকৃতি জানাই, তারা বলে তালুত কি করে বাদশা হতে পারে, তার তো কোনো সেরকম ধন সম্পদ নেই, তাই এই প্যারাগ্রাফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন বাদশা হওয়ার জন্য ধন সম্পদের মালিক হওয়া জরুরী নয়, বরং বাদশা হওয়ার জন্য জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি থাকতে হবে,

পরিশেষে বনী ইসরাইল তালুতকে এই শর্তে বাদশা

মানতে রাজি হয় যে, তাদেরকে কোনো একটি নিদর্শন দেখাতে হবে যেটি তার বাদশাহীকে প্রমাণ করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হলো: তালুতের বাদশাহীর নিদর্শন হলো, আশদুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের যে মোবারক সন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেটি ফেরেশতারা হযরত তালুতের সময়কালে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে,

অবশেষে বনী ইসরাইলরা হযরত তালুতকে বাদশা মেনে নেয়, এবং উনার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধের রওনা হয়,

জালুত শত্রুর সৈন্য বাহিনীর সবচেয়ে বড় কমান্ডার এবং সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সাহসী ছিল, সে তালুত এবং বনী ইসরাইলকে একের পর এক চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে এবং এভাবে কয়েকদিন চলে যায় কিন্তু কেউ তার মোকাবেলা করার সাহস দেখায়নি, হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের পিতা দাউদ নবী ওই যুদ্ধের সময় একজন টগবগে জোয়ান ছিল, উনার তিনজন বড় ভাই ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উনি পিতার সবচেয়ে ছোট সন্তান হওয়ার কারণে পিতার খেদমত করার জন্য বাড়িতেই থেকে যান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি

একদিন পিতা, বড় ভাইদের খবর নেওয়ার জন্য দাউদ আলাইহিস সালামকে যুদ্ধে পাঠায়, যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে দেখতে পান জালুত একের পর এক বনী ইসরাইলকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তার

মোকাবিলার সাহস দেখাচ্ছে না, তখন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম রেগে ফেটে পড়েন, এবং স্বয়ং নিজেই জালুতের মোকাবেলা করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।